প্রথম আলো

ভ্রমণ

আজকের গন্তব্যের নাম আন্দাসিবে

মাদাগাস্কারে গিয়েছিলেন বাংলাদেশি চার সাইক্লিস্ট। আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রটিতে সাইকেলে ঘুরে দারুণ দারুণ সব অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন **মুনতাসির মামুন**। আজ পড়ুন ষষ্ঠ পর্ব

ছুটির দিনে ডেস্ক

রুটিনমাফিক সকাল ছয়টায় সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজ ৩০ কিলোমিটারের কম চালাতে হবে। এত কম

রাস্তা অতিক্রম করার কারণ আবাসন। ৩০ কিলোমিটার পর একটা হোটেল আছে। এরপর পাওয়া যাবে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর। তাই আজ বিশ্রাম নিয়ে পরদিন দীর্ঘ পথের জন্য পা বাড়াব।

আজ রাস্তা ভারি চমৎকার। দুই সাইকেল একসঙ্গে। কথা বলে বলে যাওয়া যাচ্ছে। হালকা হালকা চড়াই। উতরানো যাচ্ছে তালে তালে। মসৃণ পাকা রাস্তা। যদিও কোনো সাদা দাগ দেওয়া শোল্ডার নেই। আমরা অন্য যেকোনো বাহনের মতো মূল রাস্তায়। মাঝেমধ্যে গাড়ি আসছে। ১৮ চাকার বড় ট্রাক। এই গাড়িতে আমার ভয় কম। এরা এত উঁচু যে ড্রাইভার অনেক দূর থেকে রাস্তার সবকিছুর খেয়াল রাখতে পারে। আর যেহেতু সবচেয়ে বড় গাড়ি এটিই, তাই চালকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বেশি থাকে। তবে এদের সমীহ করতে হয়। সাইকেলচালকদের আরও বেশি। এমন গাড়িকে দেখলে যতটা সম্ভব জায়গা করে দিতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরা আমাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পার হয়ে যায়। তবে এর বাতাসের ধাক্কা জোরালো। পড়ে যাওয়া একদম অবান্তর নয়। এমন হয়েছেও আমাদের।

প্রায় এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পার হলো। বড় একটা নামা ঢাল। ১০ শতাংশ গ্রেডিয়েন্টের সাইন দেওয়া। এর মানে খুব খাড়া ঢাল। এ ধরনের রোড সাইন খুব পরিচিত, যে দেশ পাহাড়ি। প্রথমে বুঝতে অসুবিধা হতো। কোন সাইনে নামা ঢাল, কোনটা ওঠা। রাস্তার এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। প্রথম দিকে সাইনগুলোতে রেশিও বা অনুপাত দেওয়া থাকত। যেমন ১ : ৪। মানে হলো আপনি এক ইউনিট দূরত্ব অতিক্রমের সঙ্গে চার ইউনিট দূরত্বে হয় উঠে যাবেন, নয়তো নামবেন। এই ইউনিট বা এককের মান অবশ্য দেওয়া থাকত না। কিলোমিটার হলে কিলোমিটার। মাইল হলে মাইল। যে দেশে যে পদ্ধতিতে সড়কের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, তা। কিন্তু সড়কে গাড়ির প্রাধান্য। গাড়ি দ্রুতগামী। তাই চালকের জন্য বুঝতে সমস্যাই হতো এই আনুপাতিক হারের হিসাব। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য শতকরা বা পার্সেন্টেজ দিয়ে বর্তমানের ঢালের পরিমাপ বোঝানো হয়। যে সাইনে সংখ্যাগুলো নিম্নমুখী, তা নামা ঢাল। আর যেটাতে ঊর্ধ্বমুখী, তা ওঠা ঢাল। আর যে সংখ্যা দেওয়া থাকে, যেমন এখানে আছে ১০ শতাংশ। এর মানে হলো আমরা সামনের দিকে যে রাস্তা পাব, তা সমভূমি থেকে ১০ শতাংশ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক। ঢালের ১০ শতাংশ বেশ খাড়া। গাড়িগুলোকে লো গিয়ারে চলতে বলার নির্দেশ দেওয়া থাকে।

আমাদের জন্য এখন নামা। চঞ্চলরা এগিয়ে চোখের পলকে হারিয়ে গেল। সকালে মিষ্টি রোদ হালকা হয়ে যাচ্ছে। দূরের ধূসর মেঘমালা পেঁজা তুলোর মতো জড়ো হয়ে কালো রং ধারণ করছে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে ঘাম হয় বেশি। কুলকুল করে ঘামের নহর নেমে যাচ্ছে শিরদাঁড়া বেয়ে। আমরা সমতল থেকে উঁচুতে আছি। বৃষ্টির ভাব প্রবল । থামলাম ছবি নেওয়ার জন্য। আজ একটু আয়েশ কিংবা বিলাসিতা যা-ই বলা হোক, হতেই পারে। ভিডিও করার জন্য

ট্রাইপডে ক্যামেরা বসিয়ে সাইকেলে চড়ে বসলাম। ঢাল যে হালকা ডানে মোড় নিয়ে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেছে,Ñআমরাও সেদিকে গিয়ে থেমে যাব। হেঁটে এসে ক্যামেরা নিয়ে যাব আবার।

সাইকেলে চড়েছি, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হলো। এখন আর ক্যামেরা তুলছি না। এগিয়ে যাই। এই বৃষ্টিতে যদিও ক্যামেরার ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। নামা কতই-না সময়। ঠিক করে বসে ওঠা হয়নি, আমরা ডানের বাঁক নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে এলাম। এখন ক্যামেরা নিয়ে আসতে হবে।

বৃষ্টি বাড়ল। জ্যাকেট চড়ানো হয়েছে এর মধ্যে। ফোঁটা বড় হতে হতে পরিপক্ব বৃষ্টির আকার ধারণ করেছে এরই মধ্যে। থামতে হবে। আজ আর এত কষ্টের প্রয়োজন নেই। হেঁটে গেলেও শেষ হয়ে যাবে সময়মতো। দোকানপাট পেলেই নেমে যাব।

পাওয়া গেল। রাস্তার সঙ্গেই একেবারে। চঞ্চলদের সাইকেল দেখতে পেলাম গাছের নিচে। রাস্তা থেকে দেখা গেছে। বুদ্ধি করে যে থেমেছে, তা-ই যথেষ্ট। না হলে এই বৃষ্টিতে ভেজার কোনো মানে হয় না। সাদা চুনকাম করা কোমর উচ্চতার দেয়ালে লেখা ‘ক্যাফে’। জুতসই সরাইখানার ভাব। সামনের মাটির উঠানে দুটি বড় ঝাউগাছ। তার নিচে বৃষ্টি পড়ছে, তবে হালকা। পাতা না থাকলেও গাছের ডালেই যতটা ঠেকিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। ওর নিচেই সাইকেল রেখে ক্যাফেতে এলাম। দুই কামরার ক্যাফে। প্রথমটার তিন পাশ খোলা। কোমর উঁচু দেয়াল। লাগোয়া ঘরে একটা কাঠের কাউন্টারে সামনের দিক কাচ দেওয়া। কেক-বিস্কুটের প্যাকেটগুলো চেয়ে আছে। দামি কোনো খাবার পাওয়া যাবে না। এর ঠিক পেছনে আধা মোড়ানো লোটা কম্বল। থাকাও হয় বুঝি এখানে। জানালা আছে। টিমটিমে বাল্ব। চা-কফি পাওয়া যাবে। নুডলসের প্যাকেট দেখে জানতে চাওয়া হলো করে দেওয়া যাবে কি না। ডিম আছে। চারজনের জন্য দুই বাটি ডিম দেওয়া ঝোল ঝোল নুডলস আর কফি চাওয়া হলো।

কেতাদুরস্ত হলে বলা যেত ওপেন কিচেন। লাকড়ির দুই চুলা জ্বলে উঠল। আমরা বেতের চেয়ারে বসে বৃষ্টিবিলাস করছি । সকাল সবে সাড়ে সাতটা। খুব বিলাসী আজ। এই ক্যাফের পাশে আরও দুটো ঘর আছে। খুব খাড়া দোচালা শণের ছাদ। এত খাড়া কেন বুঝতে পারলাম না। বরফ পড়ে যেসব দেশে, সেখানে এমন খাড়া হয় চালাগুলো। চিলেকোঠা থাকে সবার ওপরে। কিন্তু এখানে তো বরফ পড়ার কথা নয়। দালান বলা না গেলেও শক্তপোক্ত স্থাপনা। পুরু মাটির কি না, বুঝতে পারলাম না। বেশ মসৃণ দেয়াল। মাটির হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। স্থাপনার বেশির ভাগ উপকরণ প্রাকৃতিক। যেমন আমরা যে ক্যাফেতে বসে আছি, তা নিতান্তই সাধারণ। তৈজসপত্র থেকে টেবিল-চেয়ার। চেয়ারগুলো বেতের। টেবিলের ওপর যদিও ফল-ফুলের ছাপের পলিথিন শিট দেওয়া। কাঠের রক্ষাকবচ। এতটুকু হতেই পারে। কিন্তু বাকি সবকিছু মনে ধরার মতো সাধারণ। কৃত্রিমতা বিবর্জিত। পরিবেশের সঙ্গে খুব মানানসই। এটা মনে হয় হালকা বিরতির জায়গা। সামনে উঠানের মতো খোলা জায়গা বড় হলেও গাড়ি আসতে পারবে না। কারণ, রাস্তা শেষ হতেই পাতাবাহারের বেড়া দেওয়া। দুই জায়গায় ফুট দুয়েকের যে ফাঁক, তা পায়ে হাঁটার জন্য বেশ বোঝা যায়। সাইকেল বা দুই চাকার যান আসতে পারবে শুধু। সামনে আরেকটা দোকান দেখা গেল। দূর থেকেই রংবেরঙের প্যাকেট ঝুলে আছে । হালকা খাবারের সব। কাদা মাড়িয়ে আর দেখতে যাওয়া হলো না।

ধোঁয়া ওঠা নুডলসের সঙ্গে কফি। কোথা থেকে এক বিড়ালের বাচ্চাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। হালকা ঘিয়ে রঙের বিড়ালের বাচ্চা অনায়াসে টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নুডলস দেওয়া হলো তাকেও! খেলও!

এক ঘণ্টা কাবার। বৃষ্টি একেবারে থামবে না। এই এলাকায় সারা বছর বৃষ্টি হয়। সুচালো চালার রহস্য এটাও হতে পারে। বৃষ্টির পানি আটকাতে পারে না সুচালো শণের চালায়। সে অপেক্ষা না করে পথ ধরা হলো আবার। সিকি ভাগ বাকি আছে মোটে। আজকের গন্তব্যের নাম আন্দাসিবে। আন্দাসিবে-মান্তাদিয়া ন্যাশনাল পার্কের খ্যাতি লেমুর আর ইনদ্রি নামের প্রাণীর জন্য। লেমুরের কথা আগেই বলা হয়েছে। আমাদের দেখাও হয়েছে। ইনদ্রিকে ছোট টেডি বেয়ার বলা হয় । আকার ছোট হলেও ভালুকের মতো লোমশ। সারা দুনিয়া থেকে এই পার্কে ঘুরতে আসে মানুষ। প্রথমে ভড়কে গিয়েছিলাম এমন জায়গায় থাকতে হবে, যেখানে ট্যুরিস্ট থিক থিক করে। উপায়ান্তর ছিল না বলেই থাকার সিদ্ধান্ত। তবে দু-একটা এমন জায়গা না দেখলে কেমন হয় আবার। ঘুরতেই তো আসা। আমরাও ট্যুরিস্ট।

অল্প দূরত্ব বাকি। একসঙ্গে চালানোর চেষ্টা থাকবে কিন্তু না হলেও হারিয়ে যাবে না। রাস্তা ভালো। বিপদ হলে হেঁটেও চলে আসতে পারবে বা কালকের মতো কেউ একজন এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে। ধুন্ধুমার গতিতে পাল্লা দিয়ে চালানো হচ্ছে। এভাবে গেলে আধঘণ্টায় পৌঁছে যাব। গতি বাড়ালাম। এগিয়ে গেলে ক্ষতি নেই।

বড়জোর আধঘণ্টা। লম্বা লম্বা শৈলশিরার মতো জায়গাটা দেখা গেল। দুই পাশে সারি সারি দোকান। টিনের চাল। ছিমছাম পরিবেশ। মানুষ আছে বেশ, তবে ঘিঞ্জি নয়। দোকানের মালা পার হয়ে ওয়াই জংশনে 'পার্ক ন্যাশনাল আন্দাসিবে মান্তাদিয়া' লেখা সাদা রঙের ইট-সিমেন্টে তৈরি রোডসাইনটা হাতের বাঁয়ে পেলাম। পার্ক দুই কিলো দূরে। আরও অনেকগুলো হোটেলে সাইন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যেকোনো একটিতে গেলেই হবে। তবে অপেক্ষা করা ভালো। এখন কোনো হোটেলে গেলে দুই দিনের ভাড়া দিতে হবে। তার কোনো প্রয়োজন নেই। ওয়াই জংশনের কোলে একটা খাবার হোটেল। ঠিক আমাদের ভাতের হোটেলের মতো। 'হোটেল জায় নোনা', তার নিচে ছোট করে লেখা 'হালাল'। হালালের থেকে বেশি টানল হোটেলটা কেমন, তা বোঝার জন্য। সময় অফুরন্ত। চঞ্চলরা আসেনি। বসতে হবে এমনিতেও।

তিন ধাপের সিঁড়িতে সাইকেল তুলতে হলো। রাস্তা থেকে ইঞ্চি কয়েক সরে শানবাঁধানো বেদি। উঠে খোলা খাবারের জায়গায় ১০-১২টা টেবিল। আমাদের হোটেলগুলো যেমন। ডান দিকে রান্নাঘর আর তার পাশে মুদিদোকান। সকালে আমরা ছাড়া আর কোনো গ্রাহক নেই। সাইকেলটা চালার নিচে নিতে নিষেধ করলেন না নারী দোকানি। বৃষ্টি বাড়ছে। খাবার আছে। ভাত-মাছ-গরুর মাংসÑযা চাই। একটু আগেই খেয়েছি। তাই শুধু চা নেওয়া হলো। নিতে বলেনি কেউ। বলবেও যে কীভাবে, তা-ও কথা। ভাষার পার্থক্য। তবে বাংলাদেশের পতাকা দেখিয়ে বললামÑবাংলাদেশ। চাহনিতে বুঝতে পারলাম দোকানের ভদ্রলোক নাম শুনেছেন হয়তো।

হাওয়ার তোড়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি চঞ্চলদের জন্য। ঝুমবৃষ্টিতে আটকে না গেলে ভালো। চায়ে চুমুক দিতে আরাম লাগছে। ঠান্ডা অনেক। জ্যাকেটটা ভিজে গেলেও ঠান্ডার জন্য চাপিয়ে রাখা হয়েছে। রাস্তার অপর প্রান্তের একই রকম হোটেল থেকে কয়েকজন আমাদের তাকিয়ে দেখছে। দেখতে আমাদের মতোই। একটু

আলাদা।

দূর থেকে চঞ্চলদের আসতে দেখলাম ধীর তালে। আমি নিশ্চিত, তারা থেমে ছিল কোথাও, না হলে এত সময় লাগার কথা নয়। ৪০ মিনিট হয়ে গেছে প্রায়। ওদের সাইকেল তুলে নিতে নিতেই আকাশের পর্দা ছিঁড়ে বারিধারায় কালো পিচের রাস্তাকেও ফরসা লাগছে। এত বৃষ্টি অনেক দিন বাদে দেখছি। বেশ বেঁচে গেছে ওরা। ঘড়িতে সাড়ে নয়টা সবে।

দুই বাটি স্যুপ-নুডলস নেওয়া হলো আবার। বেশি করে ঝাল দিয়ে। মালাগাছি মরিচের স্বাদ অতুলনীয়। কী যেন আছে। মেক্সিকান সালসার মতো একধরনের মাদকতা। যাতে দেওয়া হোক, স্বাদ জমে ক্ষীর। নাকে-মুখে জল আসে যদিও। তাতে কী? যত ঝাল তত মজা। কোন হোটেলে থাকা যায় জানতে চাওয়া হলো। ওনারা হোটেল ফিয়ো নাই আলা বললেন। এটা নাকি ভালো। পার্কের মুখে। গুগল তা-ই বলছে। আমাদের বাজেটের মধ্যে এটাই সেরা। ফোন করা হলো। চেক ইনের সময় ১২টা হলেও আমরা এখন আসতে পারি, তার জন্য বাড়তি টাকা দিতে হবে না। ১২টা বাজতে বাকিও বেশি নেই। এখানে বিল মিটিয়ে ওয়াই জংশনের বাঁয়ে রাস্তায় সাইকেল চালাতে থাকলাম। ফুড়ুত করে চলে আসা হলো। এক কিলোমিটারের কম হবে। রাস্তা থেকে ডানে হোটেলের হেরিংবন রাস্তা ধরে ঢুকে শণের ভারী চালের বেশ বড় কামরা। কাঠ আর কাচের ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের চওড়া দরজায় কেতাদুরস্ত আরদালি। ভড়কালাম। এখানে ভাড়া বেশি হবে মনে হচ্ছে। গুগল ভুল করে। বিশেষ করে, হোটেল ভাড়ায় তো অহরহ।

সাইকেল রেখে শামিমা আপা আর সালমা আপা গেলেন। আমরা অপেক্ষায়। নোংরা কাপড়ে ভেতরে যেতে সংকোচ লাগছে। সবার যাওয়ার দরকারও নেই। হাসিমুখেই বেরিয়ে এলেন দুজন। গুগল যা বলেছে, তা ভুল হয়েছে এবারও। তবে বাস্তবিক ভাড়া আরও কম। যাক, তাহলে আরও ভালো। (চলবে)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো